Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.32

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব: একটি পর্যালোচনা

ড. বিপ্লব বারিক*

Assistant Professor (Cont.),
Vidyasagar Teachers' Training College

সারসংক্ষেপ

ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুধর্মের পুণর্জাগরণের নেতা, উপদেষ্টা ও সত্যদ্রষ্টা হলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। সেইহেতু শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র নামে সমাদৃত। জাতিকে নতুন করে সৃষ্টি করবার জন্য সমস্ত কিছু পর্যালোচনা ও চিন্তা করবার প্রয়োজন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করে গেছেন – তার প্রমাণ হল চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ গ্রন্থসমূহ। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল তাঁর দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার প্রতিলিপি তুলে ধরার চেষ্টা করা। তিনি আমাদের দান করেছে 'বন্দেমাতরম' – সেই মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র যার যাদু সৃষ্টি করেছে আজকের নতুন ভারতবর্ষ। তিনি শুধু ব্রিটিশ সরকারের সুদক্ষ কর্মচারী ছিলেন না, তিনি সাহিত্যের সম্রাট, অন্ধ কুসংস্কারের জাজ্জ্বল্যমান প্রদীপ, জীবন ও জগতের পথ প্রদর্শক, অবহেলিত হিন্দুধর্মের অবতার। তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে জীবন ও জগতের মূল উদ্দেশ্য কি তা বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ হলেন আদর্শ মানব তথা অবতার। তিনি বিশ্বাস করেন মানব সেবার দ্বারাই ঈশ্বরের সেবা সম্ভব। তাঁর এই পথ অনুসরণ করে আগামীদিনে আমরা এক নতুন উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন সমাজ গড়ে তুলতে পারব – এটাই আমাদের অঙ্গিকার।

বীজশব্দ: ধর্ম, অধর্ম, বৃত্তি, অবতারবাদ, ভক্তি ।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব: একটি পর্যালোচনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যে কয়েকজন ধর্মীয় চিন্তাবিদ হিন্দুধর্মের পুণর্বিবেচনা ও হিতগৌরব পুণরুদ্ধারে সচেষ্ট ছিলেন তাদের মধ্যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র প্রধান ও অন্যতম। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুধর্মের পুণর্জাগরণের নেতা, উপদেষ্টা ও সত্যদ্রষ্টা হলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। সেইহেতু শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র নামে সমাদৃত। জাতিকে নতুন করে সৃষ্টি করবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়ে চিন্তা করবার প্রয়োজন আছে। সব দিকের কথাই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করে গেছেন।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.32

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার প্রতিলিপি তুলে ধরার চেষ্টা করা। ঊনবিংশ শতাব্দী তথা পরাধীন ভারতবর্ষে এক অচলাবস্থানময় সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন কিভাবে করেছিলেন তা তুলে ধরা। চিরাচরিত প্রথা ও অন্ধ কুসংস্কারের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করে ধর্মের সঠিক অর্থ কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা আলোকপাত করা। সর্বোপরি তাঁর মতে মানুষের সার্বিক কল্যাণ কি উপায়ে সম্ভব - তা আলোচনা করা।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্ম ১২৪৫ বঙ্গাব্দ ১৩ ই আষাঢ় (২৭শে জুন, ১৮৩৮) হুগলি জেলার কাছারিপাড়ায় (বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটি সংলগ্ন কাঠালপাড়া গ্রামে)। চট্টোপাধ্যায়দের আদিনিবাস ছিল হুগলি জেলার দেশমুখো গ্রামে। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – একজন সুবিখ্যাত সরকারি কর্মচারী ও বিদ্বান। মাতা দুর্গাসুন্দরী – ধার্মিক ও গৃহিণী। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তৃতীয় সন্তান, প্রথম দুইজন হলেন শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং চতুর্থজন পূর্ণচন্দ্র। পরিবারে বিদ্যাশিক্ষার আবহ থাকায় ছোট থেকেই তিনি শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন।

প্রথমে পাঁচ বছর বয়সে কুল পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের কাছে পড়াশোনা শুরু করেন। শিশু বয়সেই তার অসামান্য মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "যে বর্ণমালার পরিচয় করিতে সাধারণ বালকের পনর দিন, একমাস লাগে, সে বর্ণমালা বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে পঞ্চম বৎসর বয়সে শিক্ষা করিলেন।"[১] বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স যখন ৬ তখন তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন (বর্তমান নাম মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল)। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র তখন মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ১৮৫৬ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে ইংরেজি সাহিত্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি (১৮৫৮) অর্জন করেন। তিনি ছিলেন প্রথম দিকের ভারতীয়দের মধ্যে একজন যিনি ইংরেজি সাহিত্যে বিএ পাশ করেছিলেন। ১৮৬৯ সালে ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জন করেন।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিয়ে হয় ১৮৪৯ সালে মোহিনী নামে এক ৫ বছরের কন্যার সঙ্গে কিন্তু ১৮৫৯ সালে পত্নীর মৃত্যু হয়। ১৮৬০ সালে জুন মাসে পুণরায় বিয়ে করেন রাজলক্ষী দেবীর সঙ্গে। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে যোগদান করেন ১৮৫৮ সালে যশোরে, ১৮৬০ সালে নেগুয়া (মেদিনীপুর), খুলনা (১৮৬০, ৯ ই নভেম্বর), বারুইপুর (১৮৬৪), মুর্শিদাবাদ (১৮৭১), কলকাতা (১৮৮১), আলিপুর (১৮৮২), জাজপুর (কটক) (১৮৮৩), হওড়া (১৮৮৩, ১৪ ফেব্রুয়ারি), ঝিনাইদহ (১৮৮৫), অবসর গ্রহণ করেন ১৮৯১ সালে। তিনি ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী' ইত্যাদি। বিশেষ করে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন প্রবন্ধে যেমন 'ধর্ম্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'কমলাকান্তের দপ্তর',

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.32

'সাম্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' ইত্যাদি।

১২৮৩ সালের শেষের দিকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্মভাব ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। এইভাব প্রথম থেকে ছিল হঠাৎ করে তিনি ধার্মিক হয়ে যান নি। তবে কিছু ঘটনা তাঁর সুপ্ত ধার্মিক ভাবনায় নাড়া দিয়েছিল। সমগ্র কর্মজীবন বিদেশি আদব কায়দায় বেষ্টতি থাকলেও স্বীয় আত্মোপোলব্ধির প্রকাশ পায়, যখন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা আসন্ন প্রসবা তখন তিনি রাধাবল্লভের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের সামনে পদ্মাসনে বসে অশ্রুসিক্ত নয়নে ঠাকুরের কাছে কাতর প্রার্থনা করেছিলেন। লোকচক্ষুর সামনে এই প্রথম তাঁর প্রথম ডাক। তারপর দুই তিন বছর পরে আবার তাঁকে কাতর হয়ে রাধাবল্লভের চরণে পড়তে দেখা যায়। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র কঠিন রোগগ্রস্থ-মরণাপন্ন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাত্রিশেষে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় তিনি বংশীবদ রাধাবল্লভকে স্বপ্নে দেখলেন। পরের দিন ঠাকুরের নির্ম্মাল্য এনে শিশুর মাথায় দিলেন। শিশু অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠল। এইসমস্ত ঘটনার পর থেকে তাঁর হৃদয়ে ধর্মভাব বদ্ধমূল হল – ভক্তির ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত হল। শেষ জীবনে এই ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বতীকে বিশালতরঙ্গময়ী কুল-পরিপ্লাবনী শক্তিশালিনী নদীতে পরিণত হতে দেখা যায় তার রচিত 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে। তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটে এই গ্রন্থদ্বয়ে – স্বল্প জ্ঞান, অহঙ্কার ও নাস্তিকতায় পর্যবসিত হয়; আবার সেই জ্ঞান যত বাড়তে থাকে ততই আমাদের মন ঈশ্বরমুখী হয়। তাঁর দার্শনিক তত্ত্বগুলির পুণরায় আলোচনা করাই হল এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, "অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত – এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়? সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়াছি।"[২] তিনি শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, সত্যদ্রষ্টা ঋষিও; যিনি সর্বদা এই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কৌতুহলী। কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গা থেকে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন সাহিত্যের রসবোধ থেকে জীবন ও জগতের আত্মোপোলব্ধি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ 'ধর্মতত্ত্ব'।

অতীতের প্রতি নির্বিচার সমর্থন নয়, বাঙালীর চিন্তা মনন ও কৌতূহলকে শুভ ও স্বাস্থ্যপ্রদ বিকাশের দিকে পরিচালনার জন্য তাঁর বিচারবুদ্ধি, বিজ্ঞানবোধ ও যৌক্তিকতার সাহায্যে হিন্দুর পুরাণ শাস্ত্র ও সংহিতার হিতগৌরব পুণরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, "হিন্দুধর্ম্মের সেই মর্ম্মভাগ অমর; চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিতসাধন করিবে; কেননা মানব প্রকৃতিতে তাহার

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.32

ভিত্তি। তবে বিশেষ বিধিসকল সকল ধর্ম্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য্য ও পরিবর্তণীয়। হিন্দুধর্মের নব সংস্কারের এই স্থূলকথা"।[৩] ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবোধ, তর্ক ও যুক্তির আলোকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিধিগুলির সংস্কার সাধন যেমন করেছেন, তেমন হিন্দুধর্মের 'বখামি' গুলিকে বহিস্কার করেছেন। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে গুরুর মাধ্যমে তিনি ব্যক্ত করেছেন – "হিন্দুধর্ম মানি, হিন্দুধর্মের 'বখামি' গুলি মানি না। আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ করি"।[৪] তিনি আরো বলেন, "হিন্দুধর্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে – ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুধর্মের মর্ম্ম যে বুঝিতে পারিবে, যে অনায়াসেই আবশ্যক ও অনাবশ্যক অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে। তাহা না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই"। [৫]

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন আদর্শ ভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় না। তাঁর কথায় – "আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া তারপর উদাহরণ দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়"।[৬] সেইজন্য ধর্মতত্ত্বের পর 'কৃষ্ণচরিত্র'। 'ধর্মতত্ত্বে' মাত্র যা তত্ত্বমাত্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' তাহা দেহবিশিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানব এবং সম্পূর্ণ ধর্ম তাঁহাতেই আকার প্রাপ্ত। তিনি মনে করেন, "ধর্মাচরণ জন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই, জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান সম্ভব না। ধর্ম্মজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভব না এবং যেখানে অন্য মনুষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, সেখানে মনুষ্যের প্রীতি প্রভৃতি ধর্ম্মও সম্ভব না"।[৭]

ধর্মশিক্ষক ও সমাজশিক্ষক হিসাবে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান, ভক্তি ও অনুশীলনকে তিনি পরমধর্ম বলেছেন। কারণ ব্রাহ্মণগণ ধারক, বাহক, তাঁরাই নীতিবান, তাঁরাই বিজ্ঞানচেতক, তাঁরাই পুরাণবিদ, তাঁরাই দার্শনিক, তাঁরাই সাহিত্য প্রণেতা ও কবি। তাই অনন্ত জ্ঞানী হিন্দুধর্মের উপদেশকগণ তাঁদেরকে লোকের অশেষভক্তির গাত্র বলে নির্দিষ্ট করেছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করে বলেই ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হয়েছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিকের সম্পূর্ণ বশবর্তী হয়েছিল বলেই সহজে উন্নতি লাভ করেছিল বলে তিনি মনে করেন। তিনি কিন্তু সেইসঙ্গে সাবধানবাণী করেছেন, "যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহে, তাঁহাকে ভক্তি করিব না'। [৮] শুধু ব্রাহ্মণ কেন, হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্মানুসরণে যাঁরা যত্নশীল নয় এইরূপ আচার সর্বস্ব হিন্দু হিন্দুপদবাচ্য নয়। তাঁর মতে, "গলায় গোছা করা পৈতা, কপালে কপালজোড়া ফোঁটা মাথায় টিকি এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিণাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না। যে ম্লেচ্ছের অধিক ম্লেচ্ছ। তাহার সংস্পর্শে আসিলে হিন্দুর হিন্দুয়ানি যায়"।[৯] এমনকি হিন্দুশাস্ত্রের ভাষ্যকারদের বিচারে অতি উন্নত উদার এবং সার্বলৌকিক হিন্দুধর্ম যদি সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার উপধর্মে পরিণত হয়, তবে তা যুক্তির আলোকে বিচার করে গ্রহণ বর্জন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তিনি মনে করেন, "বিনা বিচারে ঋষিদিগের বাক্যসকল মস্তকের উপর এতকাল বহন করিয়া আমরা এই বিশৃঙ্খলা, অধর্ম এবং দুর্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এর বিনা বিচারে বহন করা কর্তব্য নহে। আপনার বুদ্ধি

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.32

অনুসারে সকলেরই বিচার করা উচিত। নহিলে আমরা চন্দনবাহী গর্দভের অবস্থায় ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভাবেই পীড়িত হইতে থাকিব – চন্দনের মহিমা কিছুই বুঝিব না"। [১০]

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচিন্তার ভিত্তি ছিল ঈশ্বর বিশ্বাস। প্রথম জীবনের ভাবনা তাঁর হৃদয় সাগরে কেবল বুদ্বুদ সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তীকালে তা বুদ্ধি দ্বারা পরিশীলিত হয়ে জ্ঞানের ব্যাপ্তিতে তাঁর হৃদয় সমুদ্রের গভীরতার সঙ্গে মিশে ধ্যানগম্ভীর স্পষ্টতা প্রাপ্ত হয়েছে। সকলের ক্ষেত্রেই এই মত পরিবর্তন স্বাভাবিক। এই মত পরিবর্তন বয়োবৃদ্ধি অনুসন্ধানের বিস্তার ও ভাবনার ছল। তাঁর মতে ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসই হিন্দুধর্মের ভিত্তি। 'ধর্মতত্ত্বে' গুরুর মুখ দিয়ে তিনি বলেছেন, "যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি"।[১১]

ঈশ্বরের স্বরূপ কীরূপ? তিনি সগুণ অথবা নির্গুণ? ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরের নির্গুণত্বকে স্পষ্ট করে কোথাও অস্বীকার করেননি, তবে তিনি সগুণ ঈশ্বর ধারণারই পক্ষপাতী। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কারণস্বরূপ তিনি 'কৃষ্ণ চরিত্রের' বলেছেন, "মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যার দ্বারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলে হইতে পারেন কিন্তু আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলে হইতে পারেন কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি না, কেননা আমাদের সে ভক্তি নাই। মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নির্গুণ এবং এই কথার উপর একটা দর্শনশাস্ত্র গড়িতে পারি, কিন্তু যাহা বলিতে পারি তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিত। 'চতুষ্কোন গোলোক' বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু 'চতুষ্কোণ গোলোক' মানে কিছুই বুঝিলাম না। সগুণ ঈশ্বর ধারণার পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের আরও যুক্তি – "হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে – অথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা দুই রকমে বুঝিয়া থাকে। ঈশ্বর নির্গুণ এবং ঈশ্বর সগুণ। ..."[১২] তাছাড়া যিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করে স্রষ্টা, ইহ জগৎ-পরজগৎ, ইহজীবন-পরজীবনের পরিচালনের বিধান দান করে বিধাতা, স্বীয় প্রভাবে জগৎ জীবন ধারণ করে ধাতা এবং জীবন জগতের বিপদে ত্রাণ কর্তা তিনি নির্গুণ হলেও ঈশ্বরের উক্ত অভিধাগুলি অসার্থক প্রতিপন্ন হবে।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁর অবতারবাদ স্বীকৃতির পথ প্রসস্থ করে। তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে গীতোক্ত অবতারতত্ত্বের অনুসরণে এই অবতারবাদের সুন্দর ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁর মূল কথা এই, ধর্মসংরক্ষণের জন্যই ভগবানের অবতার গ্রহণ। কেননা সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন এর কেউ নয়। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হতে পারেন না। কেন? প্রথমত: তিনি অশরীর, আমরা শরীরি, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্মের প্রধান বিঘ্ন। দ্বিতীয়ত: তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরি হয়ে লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। তাছাড়া মানুষ কর্ম জানে না; কর্ম কিভাবে করলে ধর্মে পরিণত

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.32

হয় তা জানে না। ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হলে তাঁর কর্মের আদর্শ মানুষের কর্মযোগের শিক্ষা সার্থক হবার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্যও ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। জীবের প্রতি করুণা করে ঈশ্বরের শরীর ধারণ। জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হয়ে জগতের অধিক উন্নয়ণ ভগবানের স্বয়ং সৃষ্টির মধ্যেই আগমন। তা তারই লীলা।

এই সম্পূর্ণ ধর্মের আদর্শ কে? ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলেন, "এই সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন জন্যই ঈশ্বরের শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতার গ্রহণ। আমি কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝিয়াছি যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য ভগবানের মানবদেহ ধারণ"। [১৩] শ্রীকৃষ্ণ শুধু অবতারই নন, বঙ্কিমচন্দ্রের স্থির সিদ্ধান্ত, "প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না"।[১৪] তিনি পুরাণের বহু অবতারবাদকে অলীক কল্পনা বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার হয়েও কিন্তু তাঁর মতে মানবধর্মাবলম্বী। তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের চতুর্থখণ্ডে দশম পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, "কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন"।

সম্পূর্ণ ধর্মের আদর্শ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে ধ্রুবতারা করে মানুষের পরমপুরুষার্থ মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। কীভাবে? অনুশীলনের মাধ্যমে। তিনি 'ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন' গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে বিশ্লেষিত এবং 'কৃষ্ণচরিত্রে' উদাহরণ দ্বারা তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'কৃষ্ণচরিত্রে' তিনি বলেছেন, "অনুশীলন ধর্মে যাহা তত্ত্বমাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শ উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রে সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া তারপর উদাহরণ দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ"।[১৫]

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার মূল ভিত্তির বিশ্লেষণ করেছেন। সুখ ও দুঃখ কি? যিনি ধার্মিক তিনি সুখী ও যিনি অধার্মিক তিনি দুঃখী। ধর্ম ও অধর্ম বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। যাহা শারীরিক নিয়ম বিরুদ্ধ তাহা শারীরিক অধর্ম্ম। শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম। যে তাতে অনিচ্ছুক, সে অধার্ম্মিক। যে সমাজে থেকে ধনোপার্জ্জনে যথাবিহিত যত্ন না করে তাকে অধার্ম্মিক বলে। অনুচিত ভোগলালসা অনেকের দুঃখের কারণ। আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে। যারা তার সম্যক্ অনুশীলন করে না বা সম্যক্ পরিচালনা করে না, তারাই দরিদ্র। সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম ও তার অভাবই অধর্ম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে পরম পবিত্র অমৃতময় ধর্ম উল্লেখিত আছে তা এই অনুশীলনতত্ত্বের উপর গঠিত।

অনুশীলনতত্ত্ব কী? পাশ্চাত্যে অনুশীলনতত্ত্ব বলতে বোঝায় নাস্তিকতা কিন্তু হিন্দুরা পরম ভক্ত, তাদের অনুশীলনতত্ত্ব জগদীশ্বরপাদপদ্মেই সমর্পিত। হিন্দুদের অনুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য হল মুক্তি কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য হল সুখ। সুখ ও মুক্তি কি এক? মুক্তি সুখ নয় –

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.32

সুখদুঃখ মাত্রেরই অভাব। মুক্তিকে সুখ বললেও সুখকে মুক্তি বলা যায় না। সুখ দুঃখ মানসিক অবস্থামাত্র – সুখ দুঃখের কোন বাহ্য অস্তিত্ব নাই। সুখ দুঃখের বাহ্য অস্তিত্ব না থাকলে তা স্বীকার করতে হবে যে উভয়ই বাহ্য অস্তিত্বযুক্ত কারণের অধীন। তাহলে সুখ দুঃখরূপ মানসিক অবস্থা যে অনুশীলনের অধীন একথা অপ্রমাণ হচ্ছে না। সুখ দুঃখ সব ত্যাগ করলে জড়পিণ্ডে পরিণত হবে। গীতায় উল্লেখিত – শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব সকল তুল্য জ্ঞান। যদি সুখে সুখী না হবে, তবে জীবনের কাজ কি? মুক্তি সুখের অবস্থা বিশেষ। সুখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোৎকর্ষ। যদি একথা ঠিক হয় তা হলে ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্যও সুখ। এই সুখ ইহকালে ও পরকালের সুখ। ধর্মের ফল ইহকালে সুখ ও যদি পরকাল থাকে তবে পরকালেও সুখ। ধর্ম সুখের একমাত্র উপায়।

ধর্ম কি? যা থাকলে মানুষ, না থাকলে মানুষ নয় তা মানুষের ধর্ম। মানুষের সমস্ত শক্তিগুলিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন যথা - শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী। শক্তিগুলিকেই বৃত্তি বলে। এই বৃত্তিগুলির উপর যুক্ত স্ফূর্ত্তি পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব। ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি হয়। পোষ্যগণকে সুশিক্ষা দিয়ে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির স্ফূর্তির জয় হয়। কার্য্যকারিণী বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও একইভাবে গড়ে উঠে না বটে তবু তার ঔচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফূরণও কতক বাঞ্চনীয় বলে যে জ্ঞান আছে, তার প্রমাণ সাহিত্য ও সূক্ষ্ম শিল্পের অনুশীলন। শারীরিকী বৃত্তির উপায় হল ব্যায়ম, শিক্ষা, আহার ও ইন্দ্রিয়সংযম। ব্রহ্মচর্য্যের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন, গার্হস্থ্যে (ভক্তি ও প্রীতি) কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন। সৎ চিৎ আনন্দের অনুশীলন হল চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন।

ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয় তাহলে জীবনের সর্ব্বাংশই ধর্ম কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। তা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম। অন্য ধর্ম্মে তা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ কেবল হিন্দু ধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল নিয়েই ধর্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর, মানুষ, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ সকল নিয়েই ধর্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী সর্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম কি আর আছে।

অনুশীলনের জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজন – সময়, শক্তি ও উপাদান। মানুষের কতগুলি শক্তি আছে, সেগুলিকে বৃত্তি বলা হয়। সেগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। তা মনুষ্যের ধর্ম। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সঙ্গে বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য - তাই সুখ। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হলে সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; এইজন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রতীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। তার মধ্যে মানুষের অবস্থা বিবেচনা করে, স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.32

উক্ত আলোচনায় যে বিষয়টি প্রতিফলিত হয় তাহল – ধর্মতত্ত্ব। ধর্মের আসল অর্থ কি তিনি তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বিশদভাবে বিশ্লেষন করেছেন। ধর্ম বলতে তিনি মানুষের ধর্ম কি হওয়া উচিত এবং কিভাবে তা পালন করা সম্ভব তা আলোচনা করেছেন। ধর্মের নামে ধর্মীয়গুরুদের যে সমস্ত ভণ্ডামি ও কুসংস্কার ছিল সেই বিষয়ে তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময় সমাজব্যবস্থা ধর্মীয় ভীতি ও অন্ধ কুসংস্কারের আচ্ছন্ন ছিল। সেই অচলাবস্থাময় পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁর দূরদর্শীতার প্রমাণ স্বরূপ দার্শনিক গ্রন্থাবলী যথা 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি। তিনি শুধু সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে চিরাচরিত ইংরেজদের কর্মচারী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন নি, তিনি হিন্দুধর্মের আসল অর্থ পুণরুদ্ধার করে জীবন ও জগতের আসল মাহাত্ম্য সবার সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি কর্ম জীবনে ইংরেজদের কর্মচারী হিসেবে অতিবাহিত করলেও স্বীয় ধর্মীয় আনুগত্য ও স্বজাত্যাভীমান কখনই পরিত্যাগ করেন নি। তিনি সর্বদা সমাজের কল্যাণকামনায় মগ্ন থাকতেন। এই বিশেষ সদ্‌গুণের দ্বারা আমরা এই শিক্ষালাভ করতে পারি যে, পরিস্থিতি যেমনই উপস্থিত হোক না কেন জাতীয়মূল্যবোধ রক্ষা করা ও স্বীয় ধর্ম অনুশীলনে কখনোই নিজেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। তাঁর এই চিন্তা-ভাবনার দ্বারা নিজেদের পরিচালিত করলে মানুষের মধ্যে ভক্তি, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসার দ্বারা ঈশ্বরসেবা সম্ভব বলে আমাদের মনে হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব। আর যে সমাজে উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ বসবাস করেন সেই সমাজব্যবস্থাও উন্নত হয়। সর্বোপরি বলা যায় যে, আমরা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হতে পারলে আগামীদিনে এক নতুন উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র

১। চট্টোপাধ্যায়, শ্রী শচীশচন্দ্র. *জীবন-চরিত,* ইউনিভার্সাল লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২।

২। দত্ত, শ্রী হীরেন্দ্রনাথ. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,* শ্রীভারতী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩।

৩। চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, কলিকাতা, ১৮৯৪ খ্রী., পৃ. ৪৭।

৪। চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, কলিকাতা, ১৮৯৪

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.32

খ্রী., পৃ. ৮৬।

৫। চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, কলিকাতা, ১৮৯৪ খ্রী., পৃ. ৩১৯।

৬। দত্ত, শ্রী হীরেন্দ্রনাথ. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র*, শ্রীভারতী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪।

৭। চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, কলিকাতা, ১৮৯৪ খ্রী., পৃ. ২৮০-২৮১।

৮। চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, কলিকাতা, ১৮৯৪ খ্রী., পৃ. ১৩৪।

৯। চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, কলিকাতা, ১৮৯৪ খ্রী., পৃ. ২২৫।

১০। চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, কলিকাতা, ১৮৯৪ খ্রী., পৃ. ৩০৮-৩০৯।

১১। চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র. *ধর্ম্মতত্ত্ব,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, কলিকাতা, ১৮৯৪ খ্রী., পৃ. ৮৩।

১২। চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র,* হরে প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৬ খ্রী., পৃ. ১৫।

১৩। চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র,* হরে প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৬ খ্রী., পৃ. ১৩।

১৪। চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র,* হরে প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৬ খ্রী., পৃ. ২৪।

১৫। চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র. *কৃষ্ণচরিত্র,* হরে প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৬ খ্রী., পৃ. ১।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore